সংলাপ প্রতিবেদন >

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যাদেশ

তথ্য অধিকার ও বাক স্বাধীনতা কি হুমকির সম্মুখীন?

আয়োজনে >

ARTICLE 19

IID
Institute of Informatics and Development

BELA

মানুষের জন্য
manusher jonno

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যাদেশ (সংশোধিত) ২০১৩

তথ্য অধিকার ও বাক স্বাধীনতা কি হুমকির সম্মুখীন?

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যাদেশ (সংশোধিত) ২০১৩ : তথ্য অধিকার ও বাক স্বাধীনতা কি হুমকির সম্মুখীন? শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভাটি যৌথভাবে আয়োজন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), আর্টিকেল নাইনটিন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন (বেলা), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ল এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) এবং ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিকস্ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি)। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৩-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং সভাপতিত্ব করেন বিলিয়া'র পরিচালক ড. শাহদীন মালিক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাঈদ আহমেদ, সিইও, আইআইডি।

সূচনা বক্তব্য: ড. ইফতেখারুজ্জামান

সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ যে অধিকার সমুন্নত করার প্রয়াশ পায়, সংশোধিত তথ্য প্রযুক্তি অধ্যাদেশটি ঠিক সেই অধিকারটিই ক্ষুন্ন করে। এই সংশোধনীর নানা অংশের সমস্যাজনক দিকগুলো তুলে ধরে তিনি সরকারের কাছে তা বাতিলের আহ্বান জানান। মূল বক্তাগণ এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ নতুন সংশোধনী ও মূল আইনটি কিভাবে বাক স্বাধীনতা এবং তথ্য অধিকারকে ব্যাহত করছে তা পর্যালোচনা করবেন ও আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবেন এই প্রত্যাশায় তিনি অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সূচনা করেন।

মূল প্রবন্ধ ১: ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার সংশোধনী: একটি আইনী বিশ্লেষণ' শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর প্রবন্ধে ড. রহমান আইনটির নানা অস্পষ্টতা তুলে ধরে বলেন কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াই 'ভাবমূর্তি' ও 'প্ররোচনা' কে প্রাধান্য দেয়ায় এ আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন অভিযোগে যে কাউকে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব। তিনি ব্যাখ্যা করেন, ৫৭ ধারায় 'প্ররোচনা'র বিষয়টি স্পষ্ট না করায় যেকোন বক্তব্যকেই পুলিশের পক্ষে প্ররোচনা হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ফৌজদারী আইনের প্রসঙ্গ টেনে ড. রহমান সংশোধিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যাদেশটির নানা সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন।

> *প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন ইলমা জাহ্‌রিয়াত জোবায়ের এবং আশিকুন নবী, আইআইডি। ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।*

বিভিন্ন উদাহরণের ভেতর দিয়ে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার অভাবের পাশাপাশি অপরাধের সাথে শাস্তির মাত্রার অসামঞ্জস্য, আসামী গ্রেফতারকারী কর্তৃপক্ষ, পুনঃতদন্তের বিধান এমন নানা বিষয়ের সমালোচনা করে এগুলো হয়রানি, দুর্নীতি ও অবিচারের সুযোগ সৃষ্টি করে বলে উল্লেখ করে অবিলম্বে এই অধ্যাদেশের ধারাগুলো পুনর্বিবেচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি সরকারের কাছে আহ্বান জানান। *(পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটির জন্য পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য)*

মূল প্রবন্ধ ২: সাঈদ আহমেদ, সিইও, আইআইডি

আইআইডি'র নির্বাহী প্রধান সাঈদ আহামেদ "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ ও তার সংশোধন: বাক স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন, ব্লগ, ফেসবুক বা অনলাইন পত্রিকার নামে যা কিছু একটা ছাপিয়ে কাউকে হেনস্থা করা বা দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা প্রতিরোধ করার জন্য আইনি কাঠামো সংশোধন, তথ্যপ্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর ৫৭ ধারায় যে ভাবে অপরাধের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা এই অপরাধ দমনে ভূমিকা রাখবে না। উপরন্তু এই ধারায় আনীত অভিযোগকে সংশোধন করে একে আমলযোগ্য, অজামিনযোগ্য, এবং শাস্তি সর্বনিম্ন সীমা ৭ বছর করায় জনসাধারণের মধ্যে অনলাইনে মত প্রকাশের বিষয়ে একটি গণভীতি সৃষ্টি হতে পারে।

তিনি আশংকা প্রকাশ করেন এই আইনে অপরাধের অস্পষ্ট সংজ্ঞায়নের কারণে সাধারণ মানুষ মত প্রকাশে নিরুৎসাহিত হবে, কিন্তু পরিচয় বা আইপি লুকিয়ে বেনামে মত প্রকাশ উৎসাহিত হবে য়ার ফলে অনলাইন অপরাধ বৃদ্ধি পাবার আশংকাও থেকে যায়। অন্যদিকে অপরাধ প্রমাণ হবার আগ পর্যন্ত দোষী বিবেচনা করার যে রীতি আইনটিতে রয়েছে তাতে হয়রানি সুযোগ সৃষ্টি হয় যা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক হয়রানির খড়গ হিসেবে নির্ভিক তরুণদের অজামিনযোগ্য ভাবে বন্দী রাখার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

তড়িঘড়ি করে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনটি সংশোধন করার সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন আইসিটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দিন-তারিখের উল্লেখ ছাড়া একটি নোটিশ রয়েছে যেখানে ৩০শে এপ্রিল ২০১৩-এর মধ্যে আইনটি সম্পর্কে অনলাইনে মতামত চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু Archive.org বা গুগল ক্যাশে এই তারিখ বিহীন নোটিশ ঠিক কবে দেয়া হয়েছিল, তা বোঝা যায়নি। তবে, প্রশ্ন হলো, এপ্রিলেই যদি খসড়াটি জনমতের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, তাহলে সংসদের বাজেট অধিবেশনে আইনটি উত্থাপিত হয়নি কেন? পরিশেষে উল্লিখিত সমস্যাগুলো সরকার যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং আসন্ন সংসদ অধিবেশনে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা ও আনীত সংশোধনী বাতিল করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। *(পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটির জন্য পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)*

মুক্ত আলোচনা

তাড়াহুড়ো করে অধ্যাদেশ জারি প্রসঙ্গে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক রিনা রয় বলেন, "যেখানে সংসদেও অধিবেশন চলছে সেখানে এত তড়িঘড়ি করে

এই অধ্যাদেশ জারির কারণ বোধগম্য নয়। এই সংশোধনের আগে কোন আলোচনা করেনি সরকার। আমরা যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মত প্রকাশে উৎসাহিত করবার জন্য কাজ করছি সেখানে এ আইনটি মত প্রকাশে বাধা দিচ্ছে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরীন তাড়াহুড়ো করে পাশ করা আইনটির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

মোহাম্মদ আলী বলেন এই আইনটি করার সময় আইনটির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকস্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচনা করা বা তাদের সম্পৃক্ত করা হয়নি। তিনি মনে করেন কম্পিউটার সমিতি, আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম,আইসিটি মন্ত্রণালয় - এদের কেউ আলোচনায় থাকলে সবার জন্য ভালো হতো।

অপরাধ ও ভাবমূর্তি সংজ্ঞায়নে অস্পষ্টতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দীন খান অপরাধের সংজ্ঞায়নে অস্পষ্টতার কথা উলেখ করে বলেন, "৫৭ ধারাতে যেভাবে অপরাধের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা অপরাধের সংজ্ঞা হতে পারে না। ধারাটি অবিলম্বে বিলুপ্ত করা উচিৎ।" ব্লাস্ট-এর অনারারী নির্বাহী পরিচালক ও বিশিষ্ট আইনজীবি সারা হোসেন বলেন এ আইনটির যে দুটি দিক আলোচনায় এসেছে তা হলো, যে কোন অপরাধের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা থাকা দরকার যাতে একজন ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তিনি অপরাধ করছেন। কিন্তু ৫৭ ধারায় অপরাধের সংজ্ঞা অস্পষ্ট। একইসাথে শাস্তির সার্বিক মাত্রাতেও ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। এছাড়া আইনটি কার বিরুদ্ধে কখন কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। ভাবমূর্তির কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক নয় বরং আমাদের সংবিধানের দিকে তাকালেই এ আইনটি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়।

শাস্তির মাত্রা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক রিনা রয় বলেন এ অধ্যাদেশে আমরা দেখছি এটি অজামিনযোগ্য অপরাধ যা খুন ধর্ষণের চেয়েও গুরুতর অপরাধ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। চেঞ্জ মেকার এর সভাপতি তানভীর সিদ্দিকী সংশয় প্রকাশ করে বলেন, "আমরা যারা এ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি, তারাও এই আইনের আওতায় পড়তে পারি। এই আইনে অপরাধ এবং শাস্তির মাত্রার মধ্যে যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তা সত্যিই হতাশাব্যাঞ্জক। যেমন- খুন ও মানহানি জাতীয় অপরাধের শাস্তি যদি সমপরিমাণ হয় সেক্ষেত্রে মানুষ বড় অপরাধের দিকে ধাবিত হবেন। এক্ষেত্রে আইনের প্রায়োগিক দিকটা নিয়ে ভাবা হয় নি।"

বাকস্বাধীনতা খর্ব

ভয়েস-এর প্রতিনিধি ফারজানা আক্তার বলেন সারাবিশ্বে যেখানে অনলাইনকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, মুক্তচিন্তার চর্চা এবং গণতন্ত্রের জন্য একটি জায়গা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, সেখানে এ ধরণের একটি অধ্যাদেশ গণতান্ত্রিক চর্চাকে রোধ করে। সামহোয়্যারইন ব্লগ-এর প্রতিনিধি গুলশান ফেরদৌস বলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশ, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য মানুষ, মানুষের কথা বলার

এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। আর সেই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি ব্যাহত হয়, তাহলে গণতন্ত্র কোথায়? গণতন্ত্রকে হত্যা করবার জন্য, গণতন্ত্রের পথ চিরতরে নষ্ট করবার জন্য যে পথ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল ২০০৬ সালে, সেই পথটাকে আরো সুগম করার জন্য এই সরকার এই ধারাটি সংশোধন করলেন। আমরা যারা গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি তারা সকলেই বিশ্বাস করি যে সরকার এই অন্ধকার থেকে জনগণকে আলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর তাই আমাদের সকলকে তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে এই আইনটির বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে।"

ব্র্যাক-এর উর্দ্ধতন পরিচালক আসিফ সালেহ এই আইনটির সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে বলেন, "চার বছর আগেও আমাদের দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিলেন ৬ লক্ষ যা বর্তমানে ৮০ লক্ষ অতিক্রম করেছে, শুধুমাত্র ফেইসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যাই ২৫ লক্ষ। তাই তথ্য প্রসারের ক্ষেত্রে এই আইনটি একটি বিশেষ প্রভাব ফেলবে। আমার মনে হয়, এখন থেকে যেকোন গুরুতর বিষয়ে ইন্টারনেটে কেউ কিছু লিখতে গেলে ৭ বা ১৪ বছরের কারাদন্ডের কথা ভাববেন।"

অন্যান্য

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, যাদের রায় বা কর্তৃত্বের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সেই জনগণকেই ক্রমাগতভাবে উপেক্ষা করা রয়েছে এবং তাদের এক ধরনের ত্রাসের রাজত্বে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এমন প্রেক্ষিতে আইনটি করা হয়েছে যাতে সরকার তাদের স্বার্থে এটি ব্যবহার করতে পারেন।"

তিনি আরো উল্লেখ করেন, এখন পর্যন্ত বিরোধীদলের পক্ষ থেকে এ আইন সম্পর্কে কোন মন্তব্য পাওয়া যায় নি। তবে আমরা আশা করি, সরকার ও বিরোধী দল জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিষয়টি নিয়ে আবারো চিন্তা করবেন।

অনুষ্ঠানের সভা প্রধান ড. শাহদীন মালিক বলেন, "সরকারের যে এই ধরনের আইন করার প্রবণতা রয়েছে সেটাকেন উচিৎ না এবং আন্তর্জাতিক দিক বিবেচনা করে আইনটি সম্পর্কে যদি একাডেমিক একটি প্রকাশনা করা যায়, তাহলে জনগণ উপকৃত হবে।"

"আই সিটি আইনের ৫৭ ধারাটি আইনে কি থাকা উচিৎ না তার একটি সর্বনিকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে" উল্লেখ করে ড. শাহদীন মালিক মায়ানমার-এ সংবাদপত্রের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, কিছুদিন আগে মায়ানমার-এ ৪টি সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর আগে ৫০ বছর যাবৎ দেশটিতে একটিমাত্র সংবাদপত্র ছিল। তাই আমাদের সরকারও এরকম চিন্তা করছে কিনা কে জানে। নাগরিক কার্যকলাপ যত বেশি ফৌজদারি আইনের আওতাভুক্ত করে ফৌজদারি আইনের বিস্তৃতি ঘটানো হয়, গণতন্ত্রের চর্চা তত বেশি ব্যাহত হয়।

অ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন বলেন,"আইসিটি যে আইনটি করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যে অর্ডিন্যান্স প্রবর্তিত হয়েছে, তাতে আমরা অত্যন্ত শংকিত। আমরা যেকোন মুহূর্তে এই আইনের খপ্পরে পড়ে যেতে পারি।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক সুপন বলেন আইসিটি অ্যাক্ট নামে সারা পৃথিবীতে যে আইনগুলো আছে, তার মূল উদ্দেশ্য সাইবার স্পেসে যে ক্রাইমগুলো হয় তা প্রতিরোধ করা এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক মানানুযায়ী মূলত: কম্পিউটারে অযাচিত প্রবেশ, পদ্ধতিগত হস্তক্ষেপ, তথ্যগত হস্তক্ষেপ এবং শিশু পর্ণোগ্রাফি-এ চার ধরনের বিষয়কে অপরাধ হিসেবে ধরা

হয়েছে। যার কোনটিই ৫৭ ধারার মধ্যে পড়ে না। এই আইনটি বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি আইন, আইসিটি পলিসি, আন্তর্জাতিক আইন এবং সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল চেতনার পরিপন্থী। বিশিষ্ট আইনজীবী জেড আই খান পান্না বলেন, "আইন মন্ত্রণালয় এই আইনটি করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছেন। ক্ষমতায় থাকার জন্য অনেকেই অনেক কালো আইন করেছেন। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আজকে যারা এ আইন করছেন তারাই পরবর্তীতে রাস্তায় নামবেন এই আইন বাতিলের জন্য।"

সমাজকর্মী এস. সাজু বলেন, "আমরা শাহবাগে আন্দোলনে নেমেছিলাম একটা বিষয় মেনে নিতে পারিনি বলে, সেটি হচ্ছে 'গুরু পাপে লঘু দন্ড'। এখন মনে হচ্ছে আমাদের আবারো আন্দোলনে নামতে হবে 'লঘু পাপে গুরু দন্ড' জারি করার কারণে।"

অধ্যাদেশ বাতিল অথবা সংশোধন

আর্টিকেল নাইনটিনের নির্বাহী পরিচালক তাহমিনা রহমান বলেন, তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রে সরকার বেস্ট প্র্যাকটিস উদাহরণ অনুসরণ করেছিল যা এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে করা হয়নি।

তিনি বলেন যে, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সরকারের প্রতি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবী জানাতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দীন খান মনে করেন আইনটি নিয়ে পার্লামেন্টের বাইরেও আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি সুশীল সমাজের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। তিনি আরও মনে করেন যে পলিটিক্যাল ট্রায়াল থেকে মুক্তির জন্য অবিলম্বে এই ধারাটির সংশোধন প্রয়োজন।

৫৭ ধারায় দুটি মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, "আইনের এই ধারাটি সম্পর্কে পুলিশ প্রশাসনের পরিষ্কার ধারণা নেই, এছাড়া বিজ্ঞ আদালতের কাছেও আইটি বিষয়ক বিষয়াদি যেমন-ওয়েবসাইট, লিংক, হোস্ট ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে বোধগম্য নয়। এই পরিস্থিতিতে একজন আইনজীবী হিসেবে আমার ভরসার জায়গাটা কোথায়? যে জটিলতাগুলো তৈরি হয়েছে, তা আমার একার নয়। বরং সারা রাষ্ট্রের। তাই এখনও সময় আছে, আমরা যদি মুখ না খুলি, আমরা যদি রুখে না দাঁড়াই, তাহলে এই বিপদে আমরা সবাই পড়বো।"

অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান বলেন, "এ আইনটিকে আমরা অসাংবিধানিক বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারি কিনা। ধারাটিতে অভিযুক্তকে অজামিনযোগ্য করার ফলে এটি আর্টিকেল ৩৩-কে আঘাত করেছে। এছাড়া সংবিধানের ৩৯ কেও এ ধারাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করার কথা বলে তারা প্রকৃতপক্ষে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবার দায় জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।"

2.1758

প্রয়োজনে আইনী লড়াইয়ের আহ্বান

সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর সমন্বয়ক দিলীপ সরকার বলেন, "আমার মনে হয়, আমরা যে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি তা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের কণ্ঠকে আরো সোচ্চার করা দরকার এবং সম্ভবপর হলে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিৎ।"

ব্লাস্ট-এর অনারারী নির্বাহী পরিচালক ও বিশিষ্ট আইনজীবি সারা হোসেন মনে করেন এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন করা যেতে পারে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন ড. হামিদা

হোসেন বলেন আইন করা হয় নাগরিকদের অধিকারের জন্য, নিয়ন্ত্রণ কিংবা চাপিয়ে দেবার জন্য নয়। যে পদ্ধতিতে এ আইনটি তৈরি করা হয়েছে তা অগণতান্ত্রিক। তিনি পরামর্শ দেন শুধু আলোচনা নয়, আইনি লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য বেসরকারি টিভি চ্যানেল এবং মিডিয়া সকলের একসাথে করবে। তা না হলে এটি কোর্টে গিয়েই সুরাহা করতে হবে।" সবাইকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বৈঠক সমাপ্ত করেন।

পরিশিষ্ট ১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার সংশোধনী: আইনী বিশ্লেষণ

ডঃ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার আওতাভুক্ত অপরাধমূলক বিষয়সমূহকে অত্যন্ত শিথিলভাবে সংজ্ঞায়িত (*loosely defined*) করা হয়েছে। ফৌজদারী আইনের মৌলিক সূত্র পরিপন্থী এরূপ সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাস্তি প্রদান ক্ষমতার অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৫৭ ধারায় অনির্দিষ্ট/অস্পষ্ট শব্দগুচ্ছ (*vague terms*)- যেমন, "রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়" - ব্যবহারের মাধ্যমে মূলত যেকোন নির্দোষ বা ন্যায়সঙ্গত অনলাইন প্রকাশনা/সম্প্রচারকে, রাষ্ট্রযন্ত্রের মর্জিমাফিক, শাস্তির আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬ ধারায় *Prejudicial Report* প্রকাশের জন্য সর্বোচ্চ ৫ বৎসর কারাদন্ডের বিধান ছিল। এই কুখ্যাত ও ব্যাপকভাবে নিন্দিত ধারাটি সুদীর্ঘকাল যাবৎ গণমাধ্যমের জন্য একটি বিরাট হুমকি হিসেবে বিবেচিত হত। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সরকারের অন্তবর্তীকালীন সরকার এই ধারাটি বিলোপের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ জাতীয় পত্রিকা প্রতিদিন তাদের অনলাইন ভার্সন প্রকাশ করে। এরূপ বাস্তবতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা কার্যত সরকারের জন্য বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিলুপ্ত ১৬ ধারার ফৌজদারী ক্ষমতা, অধিকতর শাস্তির সম্ভাবনাসহ, প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

২০০৬ সালের আইনে শাস্তির মাত্রা নিরূপণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা নীতি (*principle of proportionality*) অনুসৃত হয়নি। প্রচলিত অনান্য আইনে বিভিন্ন অপরাধের সাথে তুলনা করলে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৬ সালের আইনের ৫৭ ধারায় উলিখিত শাস্তির পরিমান দৃষ্টিকটুভাবে কঠোর (*disproportionate*)। শাস্তির মাত্রার ক্ষেত্রে এরূপ অসামঞ্জস্যতা চুড়ান্তবিচারে ফৌজদারী আইনের নৈতিক ভিত্তি ও প্রায়োগিক কার্যকারিতাকে দুর্বল করে তোলে। ২০১৩ সালের সংশোধনী অধ্যাদেশ সে সম্ভাবনাকে আমাদের সামনে আরও প্রকটভাবে উপস্থাপন করেছে।

২০১৩ সালের সংশোধনী অধ্যাদেশ শিথিলভাবে এবং অনির্দিষ্ট/অস্পষ্ট শব্দগুচ্ছ দ্বারা সংজ্ঞায়িত ৫৭ ধারার আওতাভুক্ত বিবিধ অপরাধকে আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য করার মাধ্যমে মূলত রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

১৮৬০ সালের দন্ডবিধিতে সংজ্ঞায়িত মানহানির অপরাধ জামিনযোগ্য এবং এর সর্বোচ্চ শাস্তি ২ বৎসরের কারাদন্ড। ২০১১ সালের পূর্বপর্যন্ত মানহানির অপরাধ আমলে নিয়ে আদালত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করতে পারত। এরূপ বিধানের কারণে সাংবাদিক সমাজ সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনাকাঙ্খিত হয়রানির শিকার হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০১১ সালের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রেফতারী পরোয়ানার পরিবর্তে সমন জারির বিধান করে। স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশে সরকারের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ এর কারণে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। অনলাইনে প্রকাশিত যে কোন পত্রিকার যে কোন রিপোর্টকে মানহানিকর বিবেচনায় সরকার ৫৭ ধারার প্রয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ অজামিনযোগ্য এবং উহার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাস্তি যথাক্রমে ৭ ও ১৪ বৎসর কারাদন্ড। উপরন্তু, উক্ত অপরাধ আমলে নিয়ে আদালত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করতে পারবে।

পরিশিষ্ট ২

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ ও তার সংশোধন: বাকস্বাধীনতার প্রতিবন্ধক?

সাঈদ আহমেদ
নির্বাহী প্রধান, ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আই.আই.ডি)

উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান অবদানের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এধরনের অপরাধ দমনে আইনি কাঠামো সংশোধন, তথ্যপ্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত

সামর্থ্যবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ ও তার সাম্প্রতিক সংশোধনী কেবল অপরাধের সংজ্ঞায়ন, তদন্ত, বিচার ও দন্ড দানকেই দূরহ করবে না, বরং জনগণের বাকস্বাধীনতার অবসান ও সাধারণের হেনস্থা একটি হাতিয়ারে পরিণত হবার আশংকা তৈরি করেছে।

১. অপরাধ সংজ্ঞায়নে অস্পর্শ্টতা

বাংলাদেশের পেনাল কোডে অপরাধের সংজ্ঞা এমনভাবে দেয়া হয় যেন অপরাধ করার আগেই একজন মানুষ বুঝতে পারে কী কী করলে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু আইসিটি আইনের ৫৭ (১) অনুচ্ছেদে অপরাধের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয় এবং অনলাইনে মত প্রকাশের কারণে অভিযুক্ত হবার আগে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে মতটি অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে কী ধরনের তথ্য প্রকাশ বা সম্প্রচারকে অন্যের নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধকারী বা উস্কানী প্রদানকারী চিহ্নিতকরা হবে, তা স্পষ্ট নয়। অপরাধ সংজ্ঞায়নের অস্পষ্টতার ফলে প্রকৃত অপরাধী প্রমাণ এবং নির্দোষ ব্যক্তির নিরাপরাধ প্রমাণ, উভয়ই কঠিন হবে। অপরাধের অস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন আইনি বিচারের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিচারকে উৎসাহিত করবে।

২. সীমাহীন ক্ষমতায়ণ

এখানে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সীমাহীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যেখানে একজন কর্মকর্তা নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনলাইনে মতপ্রকাশের কারণে যে কাউকে গ্রেফতার করে এবং নির্দোষ প্রমাণের আগ পর্যন্ত জামিনবিহীনভাবে আটক রেখে কার্যত: একাধারে জাজ, জুরি ও এক্সিকিউশনারের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

আইনের প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা নির্ধারণ, আইনের অপব্যবহারের প্রতিকার ও ব্যক্তি-হয়রানির বিষয়গুলো বন্ধ করার কোন দিকনির্দেশনা না থাকায়, এটি হয়রানির অস্ত্রে পরিণত হতে পারে।

৩. লঘু পাপে গুরুদন্ড ও ভীতির রাজনীতি

ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে তথ্য প্রকাশের কারণে কারো কতটুকু মানহানি ঘটলো, বা আইন শৃঙ্খলার কতটুকু অবনতি ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো, তার মাত্রা পরিমাপের সুযোগ বিজ্ঞ আদালতকে না দিয়ে, এই আইনের ন্যূনতম সাজা সাত বৎসর রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে অতিস্বল্প মাত্রার অপরাধে কেউ দোষী হলে তাকে কমপক্ষে সাত বৎসর জেলে থাকতে হবে, যা লঘু পাপে প্রচন্ড রকমের গুরুদন্ডের সামিল।

আইনটিকে পেনাল কোডের অন্যান্য আইনের সাথে তুলনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয় পেনালকোডের ৫১০ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় কারো বাড়িতে প্রবেশ করে (trespass) কাউকে বিরক্ত বা উত্যক্ত করলে (annoyance) সে সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টার জেল বা ১০টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন (বিজ্ঞ আদালতের মতানুসারে সর্বনিম্ন শাস্তি আরো কম হতেই পারে)। পেনালকোডের ৫০০ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবে কারো মানহানি ঘটালে তার শাস্তি সর্বোচ্চ ২ বছর। কিন্তু অনলাইনে কোন মত প্রকাশের কারণে কারো যদি ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়, তাহলে লেখক সর্বোনিম্ন ৭ বছর থেকে ১৪ বছরের জেল এবং অনধিক এক কোটি টাকা জরিমানার দন্ডে দন্ডিত হবেন।

পেনালকোডের ১৪৬ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি সরাসরি কোন রায়টে অংশ নিয়ে শক্তি প্রয়োগ বা ভায়োলেন্সে অংশ নিলে তার শাস্তি সর্বোচ্চ ২ বছর। কিন্তু অনলাইনে কোন লেখা প্রকাশের কারণে কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে সংশোধিত আইসিটি আইন অনুসারে লেখক সর্বোনিম্ন ৭ বছর থেকে ১৪ বছরের জেল এবং অনধিক এক কোটি টাকা জরিমানার দন্ডে দন্ডিত হবেন!

শুধু তাই নয়, সর্বোনিম্ন শাস্তি নির্ধারণে বিজ্ঞ আদালতের ক্ষমতা সীমিতও করা হয়েছে। এছাড়া, গ্রেফতারের অনুমতি ও জামিন দেয়ার ক্ষমতা রহিত করে আদালতের ক্ষমতা ব্যাপক ভাবে খর্ব করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হতে পারে। এটি অনলাইনে মতপ্রকাশ নিরুৎসাহিত করার জন্য এক ধরনের গণভীতি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

৪. অপরাধের দায়

৫৭ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকাশিত কোন কিছু "মিথ্যা ও অশীল বা সংশিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে-এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা ইহলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।"

এখানে বয়স নির্বিশেষে এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক কারো নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার দায় তথ্য প্রকাশকারীর উপরে চাপানো হয়েছে। অথচ কী ধরনের তথ্য প্রকাশ কাউকে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তা উল্লেখ করে দেয়া হয়নি। আদৌ কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগলো কিনা, অথবা কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার আদৌ কোন উদ্দেশ্য লেখকের ছিল কিনা, তাও যাচাই করার সুযোগ রাখা হয়নি। বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়ায়, যে কেউ যে কোন ধরনের তথ্যকে নিজের নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ দাবী করে

তথ্য প্রকাশকারীকে হেনস্তা করতে পারে।

৫. অপরাধ প্রমাণের দায়

সাধারণত: কাউকে অপরাধী প্রমাণের দায় অভিযোগকারীর উপর বর্তায়। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নামে যে কোন মিথ্যে তথ্য প্রকাশ করে তাকে হয়রানি করা সম্ভব। সাধারণত: কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হবার আগ পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বিবেচনা করার রীতি আছে। কিন্তু অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ধারাগুলো আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য করে দেওয়ায়, একজন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কার্যত: দোষী হিসেবেই আটক থাকতে হবে। তথ্যপ্রকাশের কথিত অপরাধকে বিচারের আগেই অজামিনযোগ্য করে না দিয়ে তা বিজ্ঞ আদালতের সন্তুষ্টির ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।

৬. তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাক-স্বাধীনতাকে নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং জনগণের তথ্য অধিকারকে সরকারীও বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাসের জন্য অপরিহার্য হিসেবে চিহ্নিত করে স্ব:প্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ (*proactive disclosure*)-কে উৎসাহিত করে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি আইনে তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধের অস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন,অভিযোগের জামিন অযোগ্যতা ও সর্বনিম্ন শাস্তির অস্বাভাবিক মাত্রা তথ্য অধিকারের মূল চেতনার পরিপন্থী, যা স্ব:প্রণোদিত তথ্যপ্রকাশকে নিরুৎসাহিত করবে এবং জনগণের তথ্য অধিকারকে ব্যাহত করবে। এটি একই সাথে বাংলাদেশের সংবিধান, তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা ও সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্পের মূল চেতনার পরিপন্থী।

৭. বাকস্বাধীনতা রোধ এবং যোগাযোগ ও উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা

উন্নয়ন, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে সহজে মতপ্রকাশের সুযোগ দানের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি জনগনের যে ক্ষমতায়ণ ঘটিয়েছে; এবং তথ্য প্রকাশ ও যোগাযোগকে সহজ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে, তা এই সংশোধিত আইনের কারণে ব্যাহত হবে। এর ফলে মতপ্রকাশের অধিকার ও চর্চা ব্যাহত হবে এবং তথ্য প্রকাশ ও যোগাযোগে ভীতির সৃষ্টি হবে যা বাকস্বাধীনতা, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে ব্যাহত করবে।

৮. বিকল্প মাধ্যম ও তারুণ্যের প্রতিবাদের ভাষা

আইনটি প্রণয়ন ও সংশোধনে দেশের যে দুইটি বড় রাজনৈতিক দলই যুক্ত ছিল, তাদের সংগঠন ও ক্ষমতায়নে তারুণ্যের প্রতিবাদের অবদান অপরিসীম। স্বৈরশাসন থেকে অনির্বাচিত সরকারের শাসনামল সব সময়ই তরুণ সমাজ তাদের প্রতিবাদের ভাষা অব্যাহত রেখেছে, যার অন্যতম মাধ্যম হলো অনলাইনের প্রকাশনা। বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে জনমত প্রকাশের মাধ্যমকে মুক্ত করার ক্ষেত্রেও ব্লগ বা অন্যান্য বিকল্প অনলাইন মাধ্যম অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইনের মতন সংশোধিত এই আইনটিও আগামীতে রাজনৈতিক হয়রানির খড়গ হিসেবে নির্ভিক তরুণদের অ-জামিনযোগ্য ভাবে বন্দী রাখার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে আমরা আশংকা করছি।

উলেখ্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ যে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে আসছিল, তা বন্ধ করতে ১৯৬২ সনে পাকিস্তানী পেনালকোডে ১৫৩বি ধারা যুক্ত করা হয়। এই ধারা অনুসারে কেউ যদি লিখিত বা মৌখিক ভাবে ছাত্রসমাজকে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে যাকে কর্তৃপক্ষ জনগণের শান্তি বিনষ্টের সম্ভাবনা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে তাকে অনধিক ২ বছরের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যে আইন এখনও বহাল আছে। ব্লগ বা অনলাইনে মতপ্রকাশ নিরুৎসাহিত করতে আইসিটি আইনের সংশোধিত ৫৭ ধারা পাকিস্তান আমলে প্রণীত ওই কালো আইনের চেয়ে শতগুণ অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করেছে।

আমাদের প্রত্যাশা সরকারের বোধদয় ঘটবে এবং আমাদের দাবী আসন্ন সংসদ অধিবেশনে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা ও আনীত সংশোধনী বাতিল করা হোক।

আয়োজনে >

ARTICLE 19

BELA

মানুষের জন্য
manusher jonno

BLAST

IID
Institute of Informatics and Development

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
BANGLADESH
Social movement against corruption